অবনীন্দ্রনাথ : রং রেখার রূপকথাকার

তরুণ মুখোপাধ্যায়

কার বাড়ি? ঠাকুরবাড়ি।

কোন্ ঠাকুর? ওবিন ঠাকুর— ছবি লেখে। (বুড়ো আংলা)

হ্যাঁ, অবনীন্দ্রনাথ ভারতখ্যাত শিল্পী। আবার লেখকও। ছোটদের জন্য, বড়দের জন্য লিখেছেন অনেক বই। প্রতিটি বই-ই শব্দ দিয়ে ছবি আঁকা। কলমই রং-তুলি হয়ে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথ স্বীকার করেছেন, 'ওর তুলিতেও ছবি কলমেও ছবি'। কেমন সেই শব্দচিত্র? শকুন্তলায় লিখেছেন,

> মালিনীর জল বড় স্থির— আয়নার মতো। তাতে গাছের ছায়া, নীল আকাশের ছায়া, রাঙা মেঘের ছায়া— সকলি দেখা যেত। আর দেখা যেত গাছের তলায় কতকগুলি কুটিরের ছায়া।

এ তো ল্যান্ডস্কেপ। আবার 'নালক' বইয়ে পড়ি,

বাতাসে অনেক ফুলের গন্ধ, আকাশে অনেক তারার আলো ছড়িয়ে পড়ল। পুবে পূর্ণিমার চাঁদ উদয় হলেন— শালগাছটির উপরে যেন একটি সোনার ছাতা। ঠিক সেই সময় বুদ্ধদেব জন্ম নিলেন।

একে শব্দ-স্পর্শ-গন্ধময় চিত্রকল্প বলা-ই যায়।

শব্দ দিয়ে ছবি আঁকতে গেলে উপমা এসেই পড়ে। 'নালক' বইয়ে দেখি, 'যেখানে কাশী, সেখানে গঙ্গা একখানি ধারালো খাঁড়ার মতো বেঁকে চলেছেন'। কিংবা 'বুড়ো আংলা'-য় লেখেন,

"বাঁ ধারে পাহাড়ের কালো কালো শিকড়ে বরফের পাহাড় যেন দুধের ফেনার মতো উথলে পড়েছে।"

এই উপমাটি নিয়ে একটুখানি বলার আছে। যাঁরা অবনীন্দ্রনাথের গদ্য পড়েছেন, দেখবেন কালো আর সাদার বৈপরীত্য ও দ্বান্দ্বিকতা বারংবার সেখানে এসেছে। এর মূলে আছে তাঁর বাল্যস্মৃতি— পদ্মদাসীর স্মৃতি। দাসী রূপোর ঝিনুক আর গরম

দুধের বাটি নিয়ে দুধ জু ড়াতে বসে গরম দুধ তোলে ও ঢালে। অবনীন্দ্রনাথ দেখেন, ''দাসীর কালো হাত দুধ জুড়োবার ছন্দে উঠছে নামছে, নামছে উঠছে।'' (আপনকথা)

'রাজকাহিনী'তে উপমা ছবি হয়ে উঠেছে। কিছু দৃষ্টান্ত দিই—

১. বরফের মতো বাতাস ধারালো ছুরির মতো বুকে এসে লাগে।

২. গাছে-গাছে রাশি-রাশি জোনাকি পোকা হীরের মতো ঝকমক করছে।

৩. মহর্ষির দুটি চোখ সকালবেলার পদ্মের পাপড়ির মতো ধীরে ধীরে খুলে গেল।

৪. কালো ঘোড়ার মুখ থেকে সাদা ফেনা চারিদিকে মুক্তোর মতো ঝরে পড়ছে।

'পথে বিপথে' বইয়েও এমন উপমা বা চিত্ররূপময়তা কম নেই।

১. বসন্ত-বাউরির সবে ওঠা কচি ডানার মতো হলদে রোদ এখনো শীতে কাঁপছে।

২. আজকের সন্ধ্যাটি শীতাতুর কালো হরিণের মতো পাহাড়ের গায়ে ঠেস দিয়ে দাঁড়ালো।

৩. জলের গায়ে সকালের আকাশ থেকে বেলফুলের মতো সাদা আলো এসে পড়েছে।

কখনো দেখেন শরতের সাদা মেঘের ডানা নীল আকাশে শ্বেতময়ূরের পালকের মতো ছড়ানো আছে।

আবার দেখি কথায় ছবি আঁকা। 'শকুন্তলা'য় বর্ণনা করেন, 'গাছের উপর টিয়াপাখি লাল ঠোঁটে ধান খুঁটছিল'। কিংবা 'মারুতির পুঁথি'তে লেখে 'কালো মেঘের রথ সূর্যের আলো অন্ধকার করে দক্ষিণমুখে চলে গেল। অথবা 'ভূতপত্রীর দেশ'-এ পড়ি— 'মাঠের মাঝে একটা শেওড়া গা ঝোপ, অন্ধকারে কালো বেড়ালের মতো গুঁড়ি মেরে বসে আছে।' ছবি যে কত চিত্রময়, স্পর্শময় হয় তা অবনীন্দ্রনাথই দেখিয়েছেন, 'নালক'-এর বই-এর বর্ণনা— 'নিশুতি রাতে কালো আকাশে তারা ফুটেছে, বাতাস ঘুমিয়ে জলে ঢেউ উঠছে না, গাছে পাতা নড়ছে না'। এই নিঃশব্দের ভাষা তাঁর কলমে বাঙ্ময় হয়ে উঠেছে নিঃসন্দেহে। বাণভট্টের 'কাদম্বরী' পাঠে রবীন্দ্রনাথের মনে হয়েছিল, কবির রং ফলাতে আনন্দের সীমা নেই। অবনীন্দ্রনাথ জাত শিল্পী। রং তুলি নিয়েই তাঁর জগৎ। কিন্তু যখন কলম তুলে নেন, তখন যেমন কথার ছবি আঁকেন, তেমনি তাকে রঙে রঙে ভরে দেন। রঙের তুমুল কোলাহলে আমরা মেতে উঠি; মগ্ন হই আত্মকথা, স্মৃতিকথা বাদ দিলে তাঁর অন্য সব লেখা— যা ছোটদের জন্য সবই 'রঙ-রেখার রূপকথা'। তাঁর 'ক্ষীরের পুতুল' বইয়ে নীল রং

আর সোনা রং কী মাধুর্য এনেছে, অংশবিশেষ উদ্ধৃত করলেই বোঝা যাবে।

১. নীল মাণিকের কাছে নীল গুটিপোকা নীলকান্তমণির পাতা খেয়ে, জলের মতো চিকন, বাতাসের মতো ফুরফুরে, আকাশের মতো নীল রেশমে গুটি বাঁধে।

২. সন্ধ্যাবেলা সোনার জাহাজ সোনার পাল মেলে অগাধ সাগরের নীল জল কেটে সোনার মেঘের মতো পশ্চিম মুখে ভেসে গেল।

পড়তে পড়তে আমরা রঙের স্রোতে ভেসে যাই। দু'চোখ ভরে যায়।

সাহিত্যে রঙের ভুমিকা কি? শিল্পী দেলাক্রোয়া করেন, রং 'কল্পনাকে সমৃদ্ধ করে, বস্তুকে নির্ণয় করে, এবং তাকে অবস্থিতি দান করে।' মহাকবি গ্যেটের মতে, every colour producess a district impression on the mind. রঙের তাৎপর্যনিয়ে বিশেষজ্ঞরা নানারকম বলেছেন। পাশ্চাত্য ভাবনার সঙ্গে প্রাচ্য ভাবনায় রঙের গুঢ়ার্থ সর্বদা মেলে না। যেমন, পশ্চিমী ধারণায়

Red = Passionate and exciting
Blue = Depressing and sad
Yellow = Serene and Joy

এবার মনের সঙ্গে রঙের প্রতিক্রিয়া নিয়ে সাধারণ ভাবনা—

লাল — সাহস, পৌরুষ, বিদ্রোহ, ক্রোধ, উষ্ণতা

নীল — বিষাদ, বেদনা, ভয়, প্রশান্তি, অবসাদ

হলুদ — আবেগ, সারল্য, আনন্দ, যৌনতা, উত্তেজনা

সবুজ — যৌবন, প্রাণশক্তি, সজীবতা, শান্তি, মহত্ত্ব ইত্যাদি।

ভারতীয় তন্ত্রে সাদা (শব্দ) তার স্থান মাথায়। লাল (স্বাদ) তার স্থান মুখে। নীল (স্পর্শ) তার স্থান হৃদয়ে। হলুদ (দৃশ্য) থাকে নাভিতে। আচার্য ভরত রঙের ব্যাখ্যায় বলেন, শ্যাম — শৃঙ্গার; রক্ত — ক্রোধ, শ্বেত — হাসি, নীল — বীভৎস; গৌর — বীরত্ব।

অবনীন্দ্রনাথ শিল্পী রঙের এইসব রহস্য তাঁর জানা। 'বাগেশ্বরী শিল্পপ্রবন্ধাবলী'তে রঙ নিয়ে বলেওছেন। তবে সাহিত্য সৃষ্টির সময় কেউই এমন নির্দেশিকা মেনে চলেন না। রঙের মধ্যে যে ঐশ্বর্য প্রাচুর্য, আনন্দ আছে তা-ই প্রতিফলিত হয় লেখায়। দৃষ্টান্ত হিসেবে 'রাজকাহিনী'র কথা বলা বলা যায়। কর্ণেল টডের 'রাজস্থান' তাঁর মুল অবলম্বন। যেখানে হিন্দু বীরদের সাহস, বীরত্ব বর্ণিত হয়েছে। আদিবাসী ভীল প্রমুখের আনুগত্য; প্রভুভক্তি, বীরত্ব একসুত্রে গাঁথা হয়েছে। এমন রাজকথাকে অবনীন্দ্রনাথ মনোরম ভাষায় শুধু বর্ণনা করেছেন, তা নয় রঙে রঙে তাকে তৈলচিত্রের মতো কখনো-বা ল্যান্ডস্কেপের মতো সাজিয়ে দিয়েছেন।

হয়ে উঠেছেন 'ছবি লেখা' অবন ঠাকুর। যেমন—

"সাতটা সবুজ ঘোড়ার পিঠে আলোর রথে কোটি কোটি আগুনের সমান জ্যোতির্ময় আলোময় সূর্যদেব দর্শন দিলেন।"

রানী পদ্মিনীর রূপবর্ণনায় পড়ি।

বাঁকা মল পরা কী সুন্দর দুখানি পা, ধানী রঙের পেশোয়াজে মুক্তোর ফুল, গোলাপী ওড়নায় সোনার পাড়, পান্নার চুড়ি, নীলার আংটি, হীরার চিক।

প্রতিটি রত্ন থেকে রং ও দ্যুতি ঝিলিক দিয়ে ওঠে। রক্তমাখা অস্ত্র, হিংসা রঙে চাপা পড়ে যায়। 'নালক' গ্রন্থে ছবি ও রঙের ছড়াছড়ি।

১. নদীর ওপারেই মেঠো রাস্তা, সবুজ শাড়ির শাদা পাড়ের মতো সরু ও সোজা।

২. পৃথিবীর এক পারে সোনার শিখা, অন্যপারে রূপোর রেখা দেখা যাচ্ছে।

আবার তাঁর 'বুড়ো আংলা'য় বঙ্গভূমি রঙে রঙে মায়াময় হয়ে উঠেছে।

ক. সবুজ ছকগুলো ধানক্ষেত— নতুন শিষে ভরে রয়েছে,
হলুদ ছকগুলো সরষে ক্ষেত— সোনার ফুলে ভরে গিয়েছে।

খ. মাঝে মাঝে বড় বড় সবুজ দাগগুলো সব বন। কোথাও সবুজ, কোথাও লাল, কোথাও ফিকে নীলের ধারে ঘন সবুজ ছককাটা ডোরাটানা জায়গাগুলো। নদীর ধারে গ্রাম।

'আলোর ফুলকি' বইয়ে রঙের উচ্ছ্বাস কম নেই।

সামনে নীলের উপর হলদে আলো লেগে সমস্ত আকাশ ধানী রঙে সবুজ হয়ে উঠলো। মেঘগুলোতে কমলা রঙ আর দূরের পাহাড়ে মাঠে সব জিনিসে কুসুমফুলের গোলাপী আভা পড়ল।

'মারুতির পুঁথি' পড়া যাক।

দশদিন পরে সূর্য উঠল তেলের মতো হলুদ গোলা আকাশে একটিবার— তার পরেই লোহার কস্ ধরা কালো মেঘের রথ সূর্যের আলো অন্ধকার করে দক্ষিণ মুখে চলে গেলো।

শিল্পী ও শিষ্য নন্দলাল বসুকে চিঠিতে বলেন, 'রং-এর ধারায় (রূপ) হৃদয় হারায়' এই দেখতে পাই বিশ্বচিত্রে। শিল্পতত্ত্ব আলোচনায় বলেছেন, 'সুন্দর ধরা দিচ্ছেন সকল দিকে নানা সাজে নানা রূপে বনে সুরে ছন্দে (বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী) মেয়ে সুরূপাকে যে চিঠি লেখেন (১৯৩১)-এ সেখানেও রং এসে পড়ে।

ক. একদল পায়রা ছাতে নীল আকাশের গায়ে কালো দিয়ে লেখা

খ. ফুলগুলো লাল জামা পরা টুনুদিদির খোকাটির মতো,

কখোনো বলেন, 'সোনার বাংলার অপরূপ রং দেখে চোখ জুড়িয়ে যায়।

অবনীন্দ্রনাথের গদ্য পড়েও আমরা রঙের আভায় দু'চোখ রাঙিয়ে নিই। আমাদেরও চোখ জুড়ায়, মনে ভরে যায়।

অবন ঠাকুর ভাষায় ছবি লেখেন। আবার শিল্পী যখন তখন গ্রন্থচিত্রণেও মগ্ন হন। মূলত রবীন্দ্রনাথ মানে রবিকার বইয়ে জন্য ছবি আঁকার অনুরোধ পেয়ে তিনি উজ্জীবিত হয়েছিলেন। ১৮৯১ সালে 'চিত্রাঙ্গদা' নাট্যকাব্যটি লেখা হলে তাকে চিত্রিত করার ইচ্ছে হলো রবীন্দ্রনাথের। অবনীন্দ্রনাথের আঁকা ৩২টি ছবি নিয়ে ১৮৯৩-এ প্রকাশিত হলো সচিত্র 'চিত্রাঙ্গদা'। লিথো পদ্ধতিতে আঁকা সেইসব ছবি। যেখানে আছে শিবমন্দির, সরোবরের সিঁড়ি, ভাসমান পদ্ম, ভাঙা ধণুক, ঘোড়া ইত্যাদি। রবীন্দ্রনাথ খুব খুশী হয়ে বইটি ভাইপোকে উৎসর্গ করেন। এরপর 'বিদায় অভিশাপ' নাট্যকাব্যের কচ ও দেবযানীর রঙিন ছবি আঁকেন— যা দেশি ও বিদেশি চিত্রকলার মিশ্রণে নতুন এক ভঙ্গি। ১৮৯৫-এ কবির 'নদী কাব্য প্রকাশিত হয়। যেখানে একুশটি রেখাচিত্র এঁকেছিলেন অবনীন্দ্রনাথ। এখানেও দেশি ও বিদেশি টেকনিকের অপূর্ব মিলন ঘটেছে।

ইংরেজি অনুবাদে রবীন্দ্রনাথের কিছু বই প্রকাশিত হলে, সেগুলিও ছবিসহ বের করতে কবি ইচ্ছুক হন। 'দি ক্রিসেন্ট মুন'-এ অবনীন্দ্রনাথ কয়েকটি ছবি এঁকে দেন। 'জগৎ পারাবারের তীরে' বা 'রাজার বাড়ি'র ইলাস্ট্রেশন করেন। এরপর 'তোতাকাহিনী (The parrot's training, 1918) প্রকাশ পায়, যার প্রচ্ছদ করেন নন্দলাল বসু। আর বইয়ের ভিতরে ছবি আঁকেন অবনীন্দ্রনাথ। নিষ্প্রাণ ও অন্তঃসারশূন্য শিক্ষাব্যবস্থাকে কবি যেভাবে ব্যঙ্গ করেছেন, সেই ভঙ্গি ছবিতেও প্রকাশিত হয়েছে। সমালোচক ইন্দ্রাণী সেনগুপ্তের ভাষায় 'সটান ঋজু, আলোকহীন দৃঢ় একরোখা তুলির টানে' এখানে 'প্রকাশিত হয়েছে সপাট ও সটান প্রতিবাদ।' (দ্রঃ নান্দনিক স্পর্শে লেখায় ও রেখায় ওবিন ঠাকুর, ২০১৭)

অনূদিত 'গীতাঞ্জলি'র (Gitanjali and Fruit Gathering 1918) মধ্যে ছিল কুড়িটি ছবি। বেঙ্গল স্কুলের শিল্পীরাই আঁকেন; অবনীন্দ্রনাথ নির্দেশক। তিনি নিজে 'বন্দি' অলঙ্কৃত করেছিলেন। এছাড়াও অনাবৃষ্টির ছবি আঁকতে দুটি তৃষ্ণার্ত সারসকে জলাশয়ের ধারে ঠোঁট তুলে দাঁড়াতে দেখা যায়। 'বসন্তে কি শুধুই' গানে পত্রহীন এক গাছের ডাল ধরে এক নারী দাঁড়িয়ে থাকে। 'বিচিত্রিতা' বইতেও একটি ছবি এঁকেছিলেন। তাঁর ''বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী''তে অবনীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন—

শব্দের সঙ্গে রূপকে জড়িয়ে নিয়ে বাক্ যদি হলো উচ্চারিত ছবি, তবে ছবি হলো রূপের রেখার সঙ্গে কথাকে জড়িয়ে নিয়ে রূপকথা।

জীবনানন্দ দাশের কবিতা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, সেখানে আছে

তাকিয়ে দেখার আনন্দের পসরা; তাই কবিতা হয়েছে চিত্ররূপময়। এ কথা আমরা অবনীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গেও বলতে পারি। শিল্পাচার্য বলেন,

'চোখকে খুলে রাখতেই হয়, প্রাণকে জাগ্রত রাখতেই হয় মনকে পিঞ্জর-খোলা পাখির মতো মুক্তি দিতে হয়— কল্পলোকে ও বাস্তবজগতে...

অবনীন্দ্রনাথের গদ্যভুবনে এমন খোলা চোখে দেখার আনন্দ, রূপের রং আমাদের চমৎকৃত করে। তাঁর 'পথে বিপথে' যাত্রাপথের দেখার সেই আনন্দ ও বিস্ময় কেমন দুটি দৃষ্টান্ত দিই।

১. সম্মুখে দেখা যাচ্ছে একটি পদ্মের কলিকা জলের মাঝখানে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে, যেন ভূদেবী বিশ্বদেবতারে নমস্কার দিচ্ছেন। (গিরিশিখরে)

২. ঠিক যেখানটি থেকে সূর্যাস্তের নিচে সন্ধ্যার বেগুনি আঁধার চিরে নদী একটি রূপোর তারের মতো দেখা যায়, (বিচরণ)

আবার কোনার্ক মন্দির দেখে তাঁর মন ধ্রুপদী ছন্দে স্পন্দিত হয়। অনুভব করে 'পাথর বাজিতেছে, মৃদঙ্গের মন্দ্রস্বনে, পাথর চলিয়াছে তেজীয়ান অশ্বের মতো বেগে রথ টানিয়া, উর্বর পাথর ফুটিয়া উঠিয়াছে নিরন্তর পুষ্পিত কুঞ্জলতার মতো।' পাথরকে পুষ্পিত ও চলমান দেখার মধ্যে লেখকের আনন্দ ও বিস্ময় রস আছে, এতে সন্দেহ নেই।

'শকুন্তলা' তাঁর প্রথম পর্যায়ের রচনা। কিন্তু এখানে শিল্পীর চোখ উৎসাহে চঞ্চল। দেখতে পান, গাছে গাছে কত পাখি, কত পাখির ছানা পাতার ফাঁকে ফাঁকে কচিপাতার মতো ছোট ডানা নাড়ছিল। প্রকৃতির শোভা জীবজন্তু পাখি নিয়ে সপ্রাণ, সুন্দর।

গাছের ডালে টিয়াপাখি লাল ঠোঁটে ধান খুঁটছিল, নদীর জলে মনের সুখে হাঁস ভাসছিল, কুশবনে পোষা হরিণ নির্ভয়ে খেলা করছিল।

আবার 'রাজকাহিনী'তে দেখেন,

মহারাজের রাজহস্তী... তার পিঠের উপর সোনার হাওদা, জরির বিছানা হীরের মতো জ্বলে উঠল।

এই দেখায় 'কেমন যেন ঘোর তৈরি হয়। 'আলোর ফুলকি' তে বলেন, "সামনে নীলের উপর হলদে আলো লেগে সমস্ত আকাশ ধানী রঙে সবুজ হয়ে উঠল।" এই রঙের খেলায় তাঁর চোখ জুড়ায়। আমাদের মন ভরায়। 'একে তিন তিনে এক' রচনায় পড়ি, "সন্ধ্যার আকাশের কোলে দেয়ালা দিচ্ছিল একখানা মেঘ, একবার সে রঙীন আলোয়, রাঙা হয়ে উঠেই আবার ঘুমিয়ে পড়লো।"

'পাহাড়িয়া' গদ্য কবিতায় সেই দেখা চোখে পড়ে,

ঝর্ণার স্রোত ধরে ছায়া আর ছায়া
কায়া আর ছায়া পাশাপাশি
ক্ষণে ক্ষণে আসে যায়।

আবার 'রঙমহল'-এ দেখেন,

বনের তলায় বসে যায় সবুজ দরবার
ফুলে ফুলে ফুল বিছানো মসনদ জুড়ে।

বাংলার অপরূপ রূপ তাঁকে মুগ্ধ করে। প্রণত হন কৃতজ্ঞতায়। 'নালক'-এ সেই দেখার ও অনুভবের আনন্দ এইভাবে প্রকাশিত হয়েছে—

> রাত ভোর হয়ে এসেছে, শিশিরে নুয়ে পদ্ম বলছে— নমো, চাঁদ পশ্চিমে হেলে বলছেন— নমো, সমস্ত সকালের আলো পৃথিবীর মাটিতে লুটিয়ে পড়ে বলছেন— নমো।

আমাদেরও মুগ্ধ প্রণতি এর সঙ্গে যুক্ত হোক।